ইসলামের দাওয়াত - ক্রমান্বয়ে ইসলামের বাস্তবায়ন

(নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক শাইখ আহমদ মাহমুদ কর্তৃক রচিত “Dawah to Islam” বইটির খসড়া অনুবাদের একাংশ হতে গৃহীত)

ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে ইসলামকে বাস্তবায়নের যে দূষিত চিন্তাটি সমাজে বিদ্যমান সেটি এবং তা থেকে উদ্‌ভূত অন্যসব দূষিত চিন্তা যেমন বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আমরা এখানে আলোকপাত করতে চাই, সেগুলোর প্রতি ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে চাই এবং এসব চিন্তার ভ্রান্তি সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করতে চাই। সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টারত কিছু দলের লোক মানুষের মনে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে থাকে যে, ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এসেছে। এর কারণ হচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে এ জাতীয় চিন্তার জোরালো সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব প্রথমেই আমাদের বোঝা দরকার, ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে কি বোঝায়? যারা এই চিন্তাকে ধারণ করে তাদের মতে এতে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? এই চিন্তাকে ধারণ করার পেছনে কি যুক্তি রয়েছে? এবং এ ব্যাপারে শরঈ হুকুম কি?

যখন মুসলিমরা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল, বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ল এবং রাজনৈতিকভাবে অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছাল তখন এই অধঃপতিত অবস্থার ছাপ তাদের চিন্তার মধ্যেও ফুটতে শুরু করল। যারা তখন ইসলামের আনুগত্যের দাবী করত তাদের চিন্তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা এবং জীবন সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যেতনা; বরং তাদের চিন্তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা এবং জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভুল এবং দুর্বল ধারণার প্রতিফলন দেখা যেত। কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ যখন মুসলিমদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল তখন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মুসলিমদেরকে পরিবর্তন করার এবং নিজেদের কুফরী ধ্যান-ধারণা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করল। তারা তাদের বিজাতীয় চিন্তাসমূহ মুসলিমদের অন্তরে প্রোথিত করে দিল যেগুলো ভিন্ন স্বাদের ফল বহন করে এবং ইসলামের শত্‌রুদের মুখে সুন্দর শোনায় ও তাদের জিহ্বার মিষ্টতা বাড়ায়। ফলাফল যায় কাফিরদের পক্ষে এবং এই ঘটনার জন্য ইসলাম দায়ী ছিলনা বরং দায়ী ছিল ইসলামের অনুসারীদের স্পষ্ট আনুগত্য ও সঠিক জ্ঞানের অভাব। যেসব মুসলিম এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিল তারা একদিকে বাস্তবতার দ্বারা এবং অন্যদিকে পার্থিব স্বার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। যাই হোক তাদের এসব ভুল প্রচেষ্টা এবং খোঁড়া পদক্ষেপ দ্রুতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল এবং কুফরের নিকট চরমভাবে আত্মসমর্পণ করল। ফলে আমাদের ভূমিগুলোতে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা অথবা প্রতিরোধ ছাড়াই কুফর অবাধে বিচরণ করতে লাগল। এখন প্রশ্ন হল কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কিভাবে ইসলামকে আক্রমণ করল? এবং তখন মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা এই বলে ইসলামকে আক্রমণ করল যে ইসলাম যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান দিতে সক্ষম নয়। জবাবে মুসলিমরা এমনসব সমাধান বের করতে শুরু করল যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক সেহেতু তারা এই বৈপরীত্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করতে লাগল। নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে তারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল যা থেকে পরবর্তীতে আরো অনেক ভুল ধ্যান-ধারণা এবং বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয়। সেসব ভুল ধ্যান-ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহকে তখন ইসলামী শরীয়াহর উপর আরোপ করা শুরু হল যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও পুঁজিবাদের সামঞ্জস্যতা বিধানের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা যে ইসলাম যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ফলাফল দাঁড়াল এরূপ যে এসব সমাধানকে ইসলামী চিন্তা, মৌলিক নীতিমালা এবং বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হলো; এগুলো ব্যবহার করে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করা হতে লাগল যদিও এসব চিন্তাকে গ্রহণ করার মানে হচ্ছে বাস্তবে ইসলামকে পরিত্যাগ করা এবং পুঁজিবাদের অনুসরণ করা। সামঞ্জস্যতা বিধান এবং এ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত যেকোন ধ্যান-ধারণার দিকে আহ্বান ছিল প্রকৃতপক্ষে কুফরের গ্রহণ এবং ইসলামের বর্জন। এর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে আহ্বান করা হয় যাতে তারা কুফরী চিন্তাসমূহকে গ্রহণ করে এবং ইসলামের প্রকৃত দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

অতএব অধঃপতনের যুগে উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য গৃহীত এসব চিন্তা পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তুলল। ফলে উম্মাহকে চূড়ান্ত অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে তারা ব্যর্থ হল কারণ তারা নিজেরাই সেই অধঃপতিত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল।

ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে লোকজনের মুখে এমনসব কথা শোনা যেতে লাগল যা ছিল ইসলামী শরীয়াহ'র জন্য লজ্জাজনক। তারা দাবী করতে লাগল রাসূল (সা) এর চৌদ্দশত বছর পরে সেই সনাতন মানসিকতা নিয়ে ইসলামকে ব্যখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। তাদের মতে আমাদের উচিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য নিজেদেরকে এমনভাবে আধুনিকায়ন করা যাতে ইসলাম আবারো নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে। তারা বলতে লাগল ইসলামকে আধুনিকভাবে সজ্জিত করতে হবে এবং এর মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে যাতে অন্তর আবারো এতে আস্থা ফিরে পায়। একে অস্পষ্টতা থেকে এবং লোকজনের অভিযোগ থেকে বের করে আনতে হবে। ফলে ইসলামের পুরানো চেহারা আর জীবিত রইলনা।

যাইহোক এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু মুসলিম বিভিন্ন নতুন চিন্তার উদ্ভাবন শুরু করল। তারা নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিমালা উদ্ভাবন করল, এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করল এবং জীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করল। এগুলোই হচ্ছে অধঃপতিত যুগের চিন্তা যেগুলোর জন্ম হয়েছে আমাদের ভূখণ্ডগুলোতে পাশ্চাত্যের নষ্ট চিন্তাসমূহের উত্থানকালে। তখনকার মুসলিমরা ভাবতে লাগল যে ইসলাম যাতে যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারে সেজন্য যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং পাশ্চাতের আধিপত্য বিস্তারকারী চিন্তাসমূহ থেকে সুবিধা গ্রহণ করা তাদের জন্য একটি শরঈ দায়িত্ব।

এই নতুন বিন্যাসকে ধারণকারী অনেক চিন্তা সামনে আসতে শুরু করল যেমন; "ধর্ম হচ্ছে একটি নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল বিষয়", "গ্রহণ কর এবং চাহিদা পূর্ণ কর", "সেসব বিষয় গ্রহণ কর যেগুলো শরীয়তসম্মত

অথবা যেগুলো শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়", "সেটি গ্রহণ কর যেটি তুলনামূলকভাবে কম খারাপ বা কম ক্ষতিকর", "যদি পুরো বিষয়টিকে গ্রহণ করতে না পার তাহলে এর অধিকাংশকে ছুঁড়ে ফেলোনা", "ইসলামকে ক্রমান্বয়ে গ্রহণ কর", "এই বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত নয় যে সময় এবং স্থানভেদে হুকুমের পরিবর্তন হয়" "যেখানে সুবিধা বিদ্যমান সেটিই হচ্ছে আল্লাহর শরীয়াহ"। আধুনিক ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য যারা আহ্বান করত এসব চিন্তা এবং এজাতীয় চিন্তাসমূহ ছিল তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান বা মৌলিক নীতিমালা। বিশ্বব্যাপী এসব চিন্তা ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিল ফ্রিম্যাসন জামালউদ্দিন আফগানী এবং শায়খুল ইসলাম নামে পরিচিত তার ছাত্র ফ্রিম্যাসন মুহাম্মাদ আবদুহু।

অন্তরে খারাপ ইচ্ছা এবং কুপরিকল্পনা নিয়ে লোকজন এসব কথা বলতে লাগল যাতে তারা মুসলিমদেরকে তাদের শক্তির উৎস থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারে, তাদেরকে দুর্বল করে ফেলতে পারে এবং এভাবে আবারো আল্লাহর হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

অন্তরে সদুদ্দেশ্য এবং ভাল পরিকল্পনা নিয়েও কিছু লোক এসব কথা বলছিল কারণ তারা ভাবছিল উম্মাহর অধঃপতনের ফলে মুসলিমদের অসুস্থতার আরোগ্যকারী ওষুধ হিসেবে এসব চিন্তা কাজ করবে।

সদুদ্দেশ্যে বলা হোক অথবা অসদুদ্দেশ্যে এসব চিন্তার ফলাফল ছিল একই রকম। যাই হোক আমরা দ্বীনের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সচেতন করে দিতে চাই এবং তাদেরকে উপদেশ দিতে চাই এসব দূষিত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেয়ার জন্য যেগুলোর ভ্রান্তি বাস্তবে প্রমাণিত। কারণ এগুলো কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা এবং কোন অমঙ্গলও দূর করতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধতম জাতিতে পরিণত করেছেন কারণ আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই ইসলামে আছে যার বাইরে অন্যকিছুর দরকার নেই আমাদের। ইসলামের প্রকৃতিই আমাদেরকে একটি পদ্ধতির সন্ধান দেয় এবং বাধ্য করে সে অনুযায়ী বিধিবিধান নেয়ার জন্য। জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আল্লাহ দ্বীন ইসলাম নাযিল করেছেন এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীয়াহ দলীলসমূহ থেকে আল্লাহর হুকুমসমূহ জেনে নেয়া, অন্য কোথাও থেকে নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিমালাসমূহকে অবশ্যই শরীয়াহর দলীলাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে কারণ শরীয়াহ দলীলসমূহেরই বিস্তারিত প্রমাণাদি বিদ্যমান। ইজতিহাদের প্রক্রিয়া একটি নির্ধারিত বিষয় যা সবসময় একই রকম থাকবে এবং একে কোন ভাবে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। এই ভিত্তি থেকেই আমাদের অগ্রযাত্রার সূচনা হবে যা আমাদের পূর্বেও ঠিক একইভাবে শুরু হয়েছিল।

কিছু নিয়ন্ত্রিত শর'ঈ চিন্তা এবং মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করা প্রয়োজন যেগুলো দ্বারা অবশ্যই আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে যাতে সেগুলো আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারে এবং সঠিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারে ফলে তখন আমরা সে অনুযায়ী কাজ করতে পারব। উদাহরণ স্বরুপ -"যেখানে শরঈ হুকুম বিদ্যমান সেটাই স্বার্থ এবং এর বিপরীত নয়", "কাজের ভিত্তি অবশ্যই শরঈ হুকুম দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে হবে", "নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ না থাকলেই কেবল কোন বস্তু মুবাহ (অনুমোদিত) বলে গণ্য হবে", "হাসান(প্রশংসনীয়) হচ্ছে তাই যাকে শরীয়াহ হাসান সাব্যস্ত করেছে এবং কাবীহ (নিন্দনীয়) হচ্ছে তাই যাকে

শরীয়াহ কাবীহ সাব্যস্ত করেছে", "ভাল হচ্ছে তাই যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং খারাপ হচ্ছে তাই যা আল্লাহকে রাগান্বিত করে", "শরীয়াহর উপরে অন্যকিছুর প্রাধান্য নেই", "যে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে তিনি তাদের জীবনকে সংকীর্ণ এবং কঠিন করে দিবেন", "অন্য সমস্ত জাতির বাইরে মুসলিসমরা হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জাতি", "স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রকে ইসলাম অনুমোদন করে না ", " ইসলাম একটি স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা যা অন্যসব জীবনব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন।"

কিছু শরঈ মূলনীতির সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাতে পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণের অনুসরণ করতে পারি এবং তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইবতিদায় (বিদআতে) লিপ্ত হয়ে না যাই। কারণ প্রত্যেকটা বিদআতই (দ্বীনের মাঝে নতুন সংযোজন) প্রত্যাখ্যাত।

রাসূল (সা) বলেছেনঃ

তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথে যাবেনা। একটি স্পষ্ট বিষয় আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" [সীরাতে ইবনে হিশাম] এখানে কখনো শব্দটি দ্বারা পরবর্তী যুগের লোকজনকেও অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া হয়েছে যারা বিপথে যাবেনা; ফলে আমরাও এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছি।

তিনি (সা) বলেছেনঃ

"আমার উম্মত ৭৩টি ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্য থেকে একটি বাদে বাকি সবগুলো জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ তারা কারা? তিনি(সা) বললেনঃ 'আমি এবং আমার সাহাবীরা আজকে যে পথের উপরে আছি (সে পথের উপরে যারা থাকবে তারা)।'" [আবু দাউদ,আত-তিরমিযি,ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত]

তিনি (সা) বলেছেনঃ

"আমি তোমাদের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ রেখে যাচ্ছি। আমার পরে পথভ্রষ্টরা ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে বিচ্যুত হবেনা।" [ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত]

তিনি (সা) বলেছেনঃ

"আমার প্রজন্মের লোকেরা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম, তারপরে এদের পরবর্তীগণ এবং তারপরে তাদের পরবর্তীগণ...।" [মুসলিম হতে বর্ণিত]

তিনি (সা) বলেছেনঃ

"...তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে নিশ্চিতভাবেই তারা অনেক বিতর্ক দেখতে পাবে। নতুন উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাক কারণ প্রত্যেকটা নতুন বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেকটা বিদআতই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়...নিজেদেরকে আমার সুন্নাহর উপরে এবং সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর উপরে রাখ- তাদেরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।" [আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযি থেকে বর্ণিত]

তিনি (সা) আরো বলেছেনঃ

"যে কাজ আমাদের বিষয়ের (দ্বীনের) মধ্য থেকে নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারী এবং মুসলিম থেকে বর্ণিত]

এই হাদীসগুলো আমাদেরকে কল্যাণের (খায়র) অনুসরণ করতে এবং বিদআতের ব্যপারে সতর্ক থাকতে আহ্বান করে। কল্যাণের (খায়র) অনুসরণ করলে তা রাসূল (সা) এর যুগ থেকে অধিক বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে দুর্বল করে ফেলে। এ থেকে এই অনুভূতির জন্ম হয় যে যুগ যত পরবর্তী হবে তত কঠোর এবং জোরালোভাবে আনুগত্য করতে হবে আমাদের, সত্যের সন্ধানে অধিক মনোযোগী হতে হবে এবং আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে। কারণ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যাতে আমরা রাসূল (সা) এর সুন্নাহর উপরে ও সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর উপরে এবং রাসূল(সা) ও তাঁর সাহাবাদের(রা) সুন্নাহর উপরে থাকি। সুতরাং আমরা নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করবনা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের অনুসরণও করবনা, কারণ যারা এরূপ করে তারা প্রত্যাখ্যাত। অতএব প্রশ্ন হলো আজকের দিনে এসব বিষয় নিশ্চিত করার উপায় কি?

ইসলামী আক্বীদাকে নিজেদের অন্তরে স্পষ্টভাবে ও বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের এবং এটা যাতে কোন অস্পষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইসলামের পবিত্র এবং বিশুদ্ধ উৎস থেকেই নিজেদের তৃষ্ণা মিটাতে হবে আমাদের।

হুকুম বের করার যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে তা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের কারণ এটা শরঈ হুকুমসমূহকে লোকজনের খেয়াল-খুশী এবং ব্যক্তিগত মতামতসমূহ থেকে রক্ষা করে।

ইসলামকে নিজেদের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করতে হবে আমাদের; নিজেদের উপরে, নিজেদের সন্তানদের উপরে, পার্থিব যেকোন সুবিধার উপরে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরে তাকে স্থান দিতে হবে; যাতে আল্লাহর কথাগুলো জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর উপরে অন্য কিছুকেই আমরা প্রাধান্য না দেই এবং সেই অবস্থানে থাকি যে অবস্থানে সালফে-সালেহীন (পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণের) এর যুগে মুসলিমরা ছিল।

নিজেদের অন্তর থেকে কুফরের সমস্ত আবর্জনাময় চিন্তা আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে এবং এর চাকচিক্য ও উত্তেজনা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ঠিক তেমনিভাবে যেমনভাবে সাহাবা(রা) গণ ইসলামের প্রবেশদ্বারে জাহিলিয়াতের সমস্ত আবর্জনাময় চিন্তা পরিত্যাগ করে পবিত্র এবং আল্লাহভীরু হিসেবে এতে প্রবেশ করেছিলেন।

আর এসব বিষয় পালনের জন্য আমাদেরকে পূর্ববর্তী যুগের দিকেই ফিরে যেতে হবে কারণ উম্মাহর পরবর্তী যুগে এমন কিছু পাওয়া যাবেনা যা পূর্ববর্তী যুগের চাইতে উত্তম। মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটি একটি অপরিহার্য বিষয়। তাদের নিকটবর্তী হওয়া অথবা দূরবর্তী হওয়ার উপর নির্ভর করেই আমাদের অবস্থা ভাল নাকি খারাপ তা বুঝা যাবে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এখন পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে ক্রমধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে কি বোঝায়? যারা এই চিন্তাকে ধারণ করে তাদের মতে এতে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? এই চিন্তাকে ধারণ করার পেছনে কি যুক্তি রয়েছে? এবং এ ব্যাপারে শরঈ হুকুম কি?

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট শরঈ হুকুমকে একবারে বাস্তবায়ন না করে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা। একে তারা বলে 'মারহালিয়্যাহ'। এক্ষেত্রে প্রথমে মুসলিমরা এমন একটি হুকুমের বাস্তবায়ন করে কিংবা দিকে আহ্বান করে যা নিজে শরীয়তসম্মত নয় কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে এটি বিদ্যমান হুকুমের চাইতে শরঈ হুকুমের অধিক নিকটবর্তী। তারপরে তারা শরীয়তসম্মত নয় কিন্তু বিদ্যমান হুকুমের চাইতে শরঈ হুকুমের অধিক নিকটবর্তী হুকুমটিকে ক্রমধাপে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করার দিকে আহ্বান করতে থাকে। তারপরে শরীয়তসম্মত নয় এমন একটি হুকুম থেকে অন্য একটি হুকুম যা নিজে শরীয়তসম্মত নয় কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে বিদ্যমান হুকুমের চাইতে শরঈ হুকুমের অধিক নিকটবর্তী-তাতে পরিবর্তন করে অথবা পরিবর্তন করার আহ্বান জানাতে থাকে যতক্ষণ না তাদের দৃষ্টিতে যা প্রকৃত শরঈ হুকুম তা বাস্তবায়ন করতে পারছে।

এর মানে হচ্ছে অল্পকিছু শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করা এবং বাদবাকি কুফরী হুকুম বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে ততক্ষণ নীরব থাকা যতক্ষণ না শরীয়াহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ধাপে ধাপে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধাপসংখ্যা নেই। এমনকি যারা এর পক্ষে কথা বলে তাদের মতে এর জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিও নেই। একটি হুকুম বাস্তবায়িত করতে একটি, দুটি, তিনটি এমনকি এর চাইতেও বেশি ধাপের প্রয়োজন হতে পারে। এই ধরনের ক্রমান্বয়িকতার ক্ষেত্রে ধাপসংখ্যা নির্ধারণের উপর পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। ধাপসংখ্যা অল্পকিছু অথবা অনেকগুলো হতে পারে এবং প্রতিটা ধাপ বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

আক্বীদাগত বিষয়ে ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে; যেমন ইসলাম থেকে সমাজতন্ত্র এসেছে অথবা ইসলাম থেকে গণতন্ত্র এসেছে - এই মন্তব্যগুলোকে সমর্থন করা। শরঈ হুকুমগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যেমন এই বিষয়টিকে অনুমোদন করা যে একজন নারী হাঁটুর সামান্য নিচ পর্যন্ত কাপড় পরবে এবং প্রকৃত শর'ঈ হুকুম অনুযায়ী পোশাক পরিধানের জন্য সে কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে যাবে। আবার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে যেমন শরীয়ার দৃষ্টিতে হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা-এমনকি যারা ক্রমান্বয়িকতার পক্ষে কথা বলে তাদের মতেও বিষয়টি হারাম। যাই হোক তারা এরূপ দাবী করেনা যে এ বিষয়ের বাস্তবায়নই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বরং কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থা অর্জনই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এটিই হচ্ছে প্রকৃত শরঈ হুকুম যা আমাদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা। এর ফলে দেখা যাবে তারা চেষ্টা করছে নির্দিষ্ট কয়েকটি শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করতে এবং বিদ্যমান বাদবাকি অনৈসলামী হুকুমসমূহের বাস্তবায়িত থাকার ব্যাপারে এই আশায় নীরব থাকতে যে একসময় শরঈ হুকুমসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সেগুলোর প্রভাব বেড়ে যাবে এবং তাদেরই সংখ্যার আধিক্য থাকবে; তারপরে তা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে চলতে থাকবে। অথবা এই বিষয়টি দাওয়াতের ক্ষেত্রেও হতে পারে যখন লোকজনকে তারা এসব বিষয় বাস্তবায়নের দিকে আহ্বান করে। সুতরাং ক্রমান্বয়িকতার ধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা লোকজনকে তাদের এই ধারণার দিকে আহ্বান করার জন্য এ জাতীয় ধরনসমূহ ব্যবহার করে থাকে। এসব ধারণার দিকে যারা লোকজনকে ডাকে তারা অনেক ক্ষেত্রে এতটা আল্লাহভীরু হয়ে থাকে যে নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেনা কিন্তু তারপরও বিষয়টিকে গ্রহণ করে অন্যদের সুবিধা বিবেচনা করে। কারণ তারা ভাবে এরূপ না করলে লোকজন ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে; ফলে কোন কিছু না পাওয়ার চাইতে কিছু পাওয়াটাকেই তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বা মারহালিয়্যাহ এর পক্ষের যুক্তিসমূহ এবং সেগুলোর খণ্ডন প্রসঙ্গে এবার আসা যাক।

যারা এভাবে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী তারা কিছু যুক্তির উপরে নির্ভর করে যেগুলোর ব্যাপারে তারা মনে করে যে এগুলো তাদের চিন্তা এবং দাওয়াতের পক্ষে সমর্থনকারী। ফলে তারা যা করতে চাচ্ছে তার পক্ষে যুক্তি হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করে থাকে যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এক্ষেত্রে দলীলসমূহ এবং তাদের সঠিক নির্দেশনার অনুগত থাকেনি বরং নিজেদের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তারা এসব দলীলকে ভুলভাবে ব্যবহার করেছে - যা আমরা সামনে দেখতে পাব। নিচে তাদের সেসব যুক্তিসমূহ এবং সেগুলোর খণ্ডন নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১ম যুক্তি ও এর খন্ডন

তাদের মতে আল্লাহ সুদ (রিবা) একবারে হারাম করেননি বরং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধাপে ধাপে তা নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা উপহার (রিবা) হিসেবে যা কিছু দাও আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায়না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করবে।" [আল-কুরআন ৩০:৩৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা।" [আল-কুরআন ৩:১৩০]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।" [আল-কুরআন ২:২৭৮]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল" [আল-কুরআন ৪:১৬১]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আরো বলেনঃ

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" [আল-কুরআন ২:২৭৫]

এসব আয়াতের প্রেক্ষিতে যারা ক্রমধাপে ইসলাম বাস্তবায়নের সুযোগ খুঁজে তারা বলে, প্রথম আয়াতে সুদ ছিল মুবাহ। সরল সুদকে বৈধ রেখে চক্রবৃদ্ধির সুদকে নিষিদ্ধ করা হয় দ্বিতীয় আয়াতে এবং পরবর্তীতে সরল সুদকেও নিষিদ্ধ করা হয় তৃতীয় আয়াতের মাধ্যমে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে,তা পরিত্যাগ কর।" [আল-কুরআন ২:২৭৮]

তাদের মতে চতুর্থ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার সুচনা হয়েছিল প্রথমে পরোক্ষ উপদেশদানের মাধ্যমে অর্থাৎ ইহুদীদেরকে সম্বোধিত করার মাধ্যমে এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ কোন স্পষ্ট নির্দেশনা দেননি। ধাপে ধাপে বিভিন্ন আয়াত নাযিলের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সুদকে নিষেধ করেন তাঁর এ কথার মাধ্যমে –

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম" [আল-কুরআন ২ঃ২৭৫]

কেউ যদি উপরোক্ত আয়াতসমুহের সঠিক ফিকহের (আইনগত জ্ঞান) অনুসন্ধান করে, তাহলে দেখতে পাবে এক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িকতার ধারণার কোন সত্যতা নেই।

প্রথম আয়াত প্রসঙ্গ

প্রথম আয়াতটি সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয় বরং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে উপহার সামগ্রী। আয়াতটির মানে হচ্ছে কেউ যদি কাউকে কিছু উপহার দেয় এবং বিনিময়ে তার চাইতে বেশি কিছু আশা করে অথবা তা ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানায় তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোন বৃদ্ধি নেই অর্থাৎ আল্লাহ তাকে এর জন্য কোন পুরস্কার দিবেন না।

রাসুল (সা) বলেনঃ

"কেউ যদি তার হালাল উপার্জন থেকে খেজুরের সমপরিমাণ কিছু দান করে - এবং আল্লাহ হালাল ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেননা - তিনি তখন সেটা তার ডান হাতে ধারণ করেন - এবং দানকারীর জন্য তা বাড়াতে থাকেন যতক্ষণ না তা পাহাড়সম হয়ে যায় যেমনভাবে তোমরা তোমাদের ছোট্ট অশ্বকে প্রতিপালন করতে থাক।" [বুখারী থেকে বর্ণিত]

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (র) বলেনঃ “তোমরা উপহার (রিবা) হিসেবে যা কিছু দাও”। [আল কুরআন ৩০:৩৯]

এর অর্থ হচ্ছে যদি কেউ কাউকে উপহার হিসেবে কিছু দেয় এরং বিনিময়ে এর চাইতে বেশি কিছু আশা করে তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে তার বেশি কিছু পাওয়ার নেই এবং এজন্য সে পুরস্কৃত ও হবেনা। যাইহোক এতে তার গোনাহ ও হবেনা। এ অর্থেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে (আল-কুরতুবী থেকে বর্ণিত)। ইবনে কাছীর (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন কেউ যদি উপহার হিসেবে কাউকে কিছু দেয় এবং বিনিময়ে সে উত্তম কিছু আশা করে তাহলে এজন্য সে আল্লাহর কাছ থেকে কোনরকম পুরস্কার পাবে না। ইবনে অব্বাস, মুজাহিদ, আদ-দাহহাক, কাতাদাহ, ইকরামাহ, মুহাম্মদ বিন কাব এবং আশ-শাবী প্রমুখ এর নিকট থেকে এরকম ব্যাখ্যাই এসেছে আয়াতটি সম্পর্কে। এ ধরনের কাজ হচ্ছে মুবাহ (অনুমোদিত)।

ইবনে আব্বাস বলেন; “সুদ (রিবা) দু ধরনের; একটি হচ্ছে অবৈধ যা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং অন্যটিতে ক্ষতির কিছু নেই যেখানে একজন কাউকে উপহার হিসেবে কিছু দেয় এবং বিনিময়ে তার কাছ থেকে বহুগুণ আশা করে।”

এবার দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাপারে আসা যাকঃ

“তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা।” [আল-কুরআন ৩:১৩০] চক্রবৃদ্ধির সুদপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল, যা ছিল জাহিলি যুগের একটি বাস্তবতা। এখানে এমন কোন নির্দেশনা নেই যা থেকে এটা বুঝা যাবে যে সুদকে সীমিতভাবে (অর্থাৎ সরল সুদকে বৈধ রেখে কেবল চক্রবৃদ্ধির সুদকে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুফাসসিরগণের মতে (তাফসীরকার) সুদ নিষিদ্ধ করা হয় সুরা বাক্বারাহ তে এবং এটি ছিল মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সুরা। বহুগুণের সুদ নিষিদ্ধ করা হয় যে সুরাতে অর্থাৎ আলি ইমরানে তা নাযিল হয় সুরা বাক্বারাহ এর পরে। সুতরাং স্বল্পমাত্রার সুদকে আল্লাহ বৈধতা দিয়েছেন এরকম যেকোন ধারণাকে খণ্ডন করে এই ঘটনাটি। স্পষ্টতঃই বুঝা যাচ্ছে যে, সুদ সম্পর্কিত আলি ইমরানের আয়াতটি কোন ক্রমান্বয়িকতার ফসল ছিল না বরং তা ছিল কাফিরদের সুদ চর্চার স্বাভাবিক অভ্যাসের একটি উল্লেখমাত্র। সুতরাং সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম প্রথমেই নাযিল হয়েছিল।

এবার তৃতীয় আয়াতের প্রসঙ্গে আসা যাকঃ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।” [আল-কুরআন ২:২৭৮] এই আয়াতের অর্থ এরকম কিছু নয় যে, প্রথমদিকে মুসলিমদের জন্য স্বল্পমাত্রার সুদ গ্রহণের অনুমোদন ছিল যা পরবর্তীতে নিষিদ্ধ করা হয়। বরং এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তাদের ব্যাপারে যারা ইসলামে নতুন এসেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা সুদের উপর টাকা ধার দিত। সুদের অংশবিশেষ তারা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করে ফেলেছিল এবং কিছু অংশ বাকি ছিল। এজন্য যে অংশ তারা গ্রহণ করে ফেলেছে সেটি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) মাফ করে দিয়েছেন এবং যা বাকি আছে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এই বিষয়টি আল্লাহর নিম্নোক্ত কথার দ্বারাও সমর্থিতঃ

“অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে।” [আল-কুরআন ২:২৭৯]

অনুরূপভাবে রাসূল (সা) এর নিম্নোক্ত হাদিসঃ

“জাহিলি যুগের সুদকে সমাপ্ত করা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে এবং প্রথমে আমি যে সুদের সমাপ্তি ঘটিয়েছি তা হচ্ছে আল-আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।” [সীরাতে ইবনে হিশাম]

সবশেষে চতুর্থ আয়াতের প্রসঙ্গে আসা যাকঃ

“তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল” [আল-কুরআন ৪:১৬১]” এখানে যে রিবা’র

কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ঘুষ ও তদরূপ হারাম অর্থ গ্রহণ করাকে যা তৎকালীন ইহুদিরা নিয়ে থাকত। এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ

“(তারা) হারাম ভক্ষণ করে”। [আল-কুরআন ৫:৪২] এখানে সুদকে শর’ঈ অর্থে বুঝানো হয় নি।

অতএব এ সম্পর্কিত বিধানের শুরু থেকেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল এবং এমন কোন নির্দেশনা নেই যা থেকে বুঝা যাবে যে সুদ ধাপে ধাপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেশকিছু প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপেই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে ক্রমান্বয়িকতার কোন সম্পর্ক নেই।

২য় যুক্তি ও এর খন্ডন

তাদের মতে আল্লাহ ধাপে ধাপে মদ নিষিদ্ধ করেছেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।" [আল-কুরআন ২:২১৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ।" [আল-কুরআন ৪:৪৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেনঃ

"হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, আল-আনসাব (দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু), আল-আযলাম (ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ) এগুলো শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া অন্য কিছুনা। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবেনা?" [আল-কুরআন ৫:৯০-৯১]

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির ধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা এসব আয়াতের প্রেক্ষিতে বলে থাকে যে শুরুতে মদ অনুমোদিত ছিল যা প্রথম আয়াত থেকে প্রমাণিত। পরবর্তীতে এই অনুমোদনকে সীমিত করা হয় এই আয়াতের মাধ্যমে

"হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা।" [আল-কুরআন ৪:৪৩] এবং এই সীমিত অনুমোদনকে সর্বশেষে নিষিদ্ধ করা হয়।

আইনগত দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে যদি কেউ এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করে তাহলে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন ক্রমান্বয়িকতা দেখতে পাবেনা। বরং বাস্তবতা হচ্ছে নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে মদের ব্যাপারে কোন শর'ঈ হুকুমই ছিলনা। অন্যভাবে বলা যায় মদ্যপান তখন একটি অনুমোদিত বিষয় ছিল যদিও তখন মুসলিমরা মদ্যপান অব্যাহত রেখেছিল তৃতীয় আয়াত নযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত। এই ধারণাটি উমর (রা) এর নিম্নোক্ত ঘটনাটির মাধ্যমেও সমর্থিত; তিনি বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি মদের ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দাও কারণ তা আমাদের সম্পদ কেড়ে নেয় এবং মানসিকতাকে নষ্ট করে ফেলে।" জবাবে তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে" [আল-কুরআন ২:২১৯] উমর (রা) দুআ করেছিলেন এবং তার কাছে এই আয়াত পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। তিনি আবারো বললেন "হে আল্লাহ তুমি মদের ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দাও।" জবাবে তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

"হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ।" [আল-কুরআন ৪:৪৩] উমর (রা) দুআ করেছিলেন এবং তার কাছে এই আয়াত পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। তিনি আবারো বললেন "হে আল্লাহ তুমি মদের ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দাও" জবাবে তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

"হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, আল-আনসাব (দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু), আল-আযলাম (ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ) এগুলো শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া অন্য কিছুনা। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক।" [আল-কুরআন ৫:৯০] অতএব উমর (রা) এভাবেই দুআ করে যেতে থাকলেন যতক্ষণ না নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

"অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবেনা?" [আল-কুরআন ৫:৯১] জবাবে উমর (রা) বললেনঃ "আমরা নিবৃত্ত হলাম! আমরা নিবৃত্ত হলাম!" [আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, এবং আবু দাউদ থেকে বর্ণিত]

উমর(রা) মদের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলেন যা উপরে উল্লেখিত তৃতীয় আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য বৈধ ছিল। তিনি (রা) তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) কাছে প্রথম এবং দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হওয়ার পরও দু'আ করা অব্যাহত রাখলেন যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, তৃতীয় আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত মদ্যপান মুবাহ (অনুমোদিত) ছিল।

দ্বিতীয় আয়াতের মূল বিষয় ছিল সালাত, মদ্যপান নয়। অর্থাৎ এ আয়াতটি সালাতের সাথে সম্পর্কিত। কেউ যদি এই আয়াতের ফিকহ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাহলে দেখতে পাবে এখানে সালাতের সময় কাউকে

মদ্যপান করতে নিষেধ করা হচ্ছেনা বরং নিষেধ করা হচ্ছে মদ্যপ অবস্থায় সালাত আদায় করতে যাতে মুসলিমরা বুঝতে পারে তারা কি তিলাওয়াত করছে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে কোন মুসলিমকে যদি দেখা যেত এমন অবস্থায় সালাত আদায় করছে যখন তার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে অথবা সে তার সাথে মদের ভিস্তি (পানীয় বহনের জন্য ব্যবহৃত চামড়ার ব্যাগ) বহন করছে বা সে নির্দিষ্ট পরিমাণের মদ পান করেছে যা তার চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করেনি তাহলে সেক্ষেত্রে দোষের কিছু ছিল না।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ মদ্যপানকে তিরস্কার করেছেন কারণ তা ক্ষতিকর। দ্বিতীয় আয়াতে মদ্যপ অবস্থায় সালাত আদায় নিষিদ্ধ করা হয় এবং তৃতীয় আয়াতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। এই ঘটনাকে কোনভাবেই ক্রমান্বয়িক বলা যায় না কারণ সূরা আল মায়িদাহতে নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে মদ নিষিদ্ধ করার পরে রাসূল (সা) অথবা সাহাবা (রা) অথবা তাবিঈন অথবা অথবা তাদের পরবর্তীদেব মধ্যে কেউ কখনোই মদ্যপানকে অনুমোদন দেয় নি। মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণদের মধ্যে এবং মুজাতাহিদীনের মধ্যেও কেউ কখনোই কোন ফিকহের কিতাবে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িকতার কথা বলেননি। যখন পূর্ণ উদ্যমে ইসলামের বিজয় চলছিল, নতুন নতুন ভূখণ্ড ইসলামের অধীনে আসছিল এবং লোকজন দলে দলে দ্বীনের মধ্যে দাখিল হচ্ছিল তখন বিজয়ী মুসলিমদের কেউই নওমুসলিমদের নতুন ইসলামে আসার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি অথবা তাদের মদ্যপানের ব্যপারেও নীরব থাকেননি। যেসব মুসলিম বিজিত ভূখন্ডে গিয়েছিলেন তারা নওমুসলিমদের জন্য সেসব ধাপ পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যেসব ধাপ পার করা হয়েছিল। যদিও হয়তো সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী কারো কারো কাছে ক্রমান্বয়িকতা দরকারী ছিল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাদের কাছে এর কোন তাৎপর্যই ছিলনা। আমাদের প্রাথমিক যুগের ইমামদের কেউই এই ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ধারণার সাথে পরিচিত ছিলেন না বরং এটি হচ্ছে একটি নতুন আলোচনা যা দুঃসহ বাস্তবতা এবং যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির কারণে কিছু তথাকথিত চিন্তাবিদ উদ্ভাবন করেছেন। তারা নির্দিষ্ট কিছু হুকুমের ক্ষেত্রে নয় বরং পুরো দ্বীনের জন্যই এই ধারণাটিকে একটি চিন্তার পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

রাসূল (সা) যথার্থই বলেছেনঃ

"...তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে নিশ্চিতভাবেই তারা অনেক বিতর্ক দেখতে পাবে। নতুন উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাক কারণ প্রত্যেকটা নতুন বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেকটা বিদআতই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়-নিজেদেরকে আমার সুন্নাহর উপরে এবং সৎপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহর উপরে রাখ - তাদেরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।" [আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযি থেকে বর্ণিত]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বলে তাদের জন্য কি এটা বৈধ হবে যে তারা ধাপে ধাপে আসা কোন হুকুমের সর্বশেষ হুকুমকে গ্রহণ না করে বরং পূর্বের কোন হুকুমকে গ্রহণ করতে পারবে?

নিশ্চিতভাবেই এর উত্তর হচ্ছে; "না"। কারণ শরীয়াহ মদ্যপানকে সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে পূর্ববর্তী কোন হুকুম মেনে চলার অনুমোদন আমাদেরকে দেয়া হয়নি কারণ শরীআ'হ যা করতে নিষেধ

করেছে আমাদেরকে তা অবশ্যই মানতে হবে। এটাই ছিল সালাফ (পূর্ববর্তীদের) এবং খালাফ (পরবর্তীদের) উভয় প্রজন্মের অবস্থান। মদের ব্যাপারেও একই হুকুম বিদ্যমান। এই হুকুমটি কখনো বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হবেনা এবং যে মদ্যপান করবে তার অপরাধও কিছুমাত্র কমবেনা।

৩য় যুক্তি ও এর খণ্ডন

তাদের মতে শরীআ'হ দাসপ্রথার বিষয়টিকে ধাপে ধাপে সমাধান করেছে। এই মতটি সঠিক নয় কারণ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) দাসদের অস্তিত্বকে নিষিদ্ধ করেননি বরং এ থেকে উত্তরণের একটি পথ খুলে দিয়েছেন। যদি তারা আবারো অস্তিত্বলাভ করে তাহলে এ সম্পর্কিত আহকামও ফিরে আসবে এবং দ্বিতীয়বারের মত দাসদের অস্তিত্ব চোখ পড়বে।

চতুর্থ যুক্তি ও এর খণ্ডন

তাদের মতে কুরআন একবারে নাযিল হয়নি বরং ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড আকারে এসেছে যা থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনা অনুযায়ী কুরআন নাযিল করতেন যাতে মুমিনদের অন্তর শক্তিশালী হয়। প্রথমে ঈমানের বিষয়ে নাযিল হতো। এজন্য প্রথমে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা হয়েছিল এবং পরে হালাম-হারামের আলোচনা এসেছিল। কিন্তু এর মানে এই না যে নাযিলকৃত বিষয়ের অংশবিশেষ গ্রহণ করতে হবে এবং বাকি বিষয় ছেড়ে দিতে হবে। যেসব বিষয় নাযিল হয়েছিল তার পুরোটা মানার ব্যাপারেই মুসলিমরা দায়িত্বশীল ছিল তখন এবং এর বাইরে তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না। যখন শুধুমাত্র ঈমানের বিষয়ে নাযিল হয়েছিল কিন্তু কোনো হুকুম নাযিল হয়নি তখন শর'ঈ দলীলের মাধ্যমে আসা বিস্তারিত বিবরণের পুরো ইসলামের ব্যাপারেই মুসলিমরা দায়িত্বশীল ছিল। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক যেকোনো পরিস্থিতিতেই ব্যক্তিগত শর'ঈ হুকুমের ব্যাপারে মুসলিমরা দায়িত্বশীল থাকে। যেসব শর'ঈ হুকুম ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। অতএব শর'ঈ দলীলের বিস্তারিত নির্দেশনাই মুসলিমদের কর্মকাণ্ডকে নির্ধারণ করে, অন্যকিছু না। সুতরাং, পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের হাতে আর নেই।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন বলতে কী বুঝায়? এতে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এর পক্ষে কী যুক্তি রয়েছে সেগুলো পর্যবেক্ষণের পর এবার আমরা চিন্তার শরঈ প্রক্রিয়া অনুযায়ী সঠিক শরঈ মতের ব্যাখ্যা দিব।

আমরা সঠিক মতের কাছাকাছি কোনো মতের ব্যাপারে বলছি না বরং সঠিক মতের ব্যাপারেই বলছি, কারণ ক্রমান্বয়ে ইসলাম বাস্তবায়নের ধারণাটি শরীআ'হর মধ্যে নেই এবং ভুলভাবে একে শরীআ'হতে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সুযোগও নেই। ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন এবং এটি একটি শর'ঈ পদ্ধতি কিনা এর সঙ্গে

এই আলোচনাটি যতটুকু সম্পর্কিত তার চাইতে বেশী সম্পর্কিত চিন্তার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে - যাকে শরীআহ কোনোভাবেই অনুমোদন করে না। কারণ, ইসলামের একটি প্রকৃতি আছে যা অন্যসব কিছু থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। ওহীর অনুসরণের উপরেই ইসলামের প্রকৃতি পুরোপুরি নির্ভরশীল, অন্যদিকে মানুষের উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতার উপরে মানবরচিত ব্যবস্থা পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং এই উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা যত শক্তিশালীই হোক না কেন মানুষের সমস্যার সঠিক সমাধান দেওয়ার জন্য তা অপর্যাপ্ত।

যখন মুসলিমরা শরীআ'হর আনুগত্য করে তখন আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে আল্লাহর উপর ঈমানকে মেনে নিতে হবে, নতুবা তাদের আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যখন সে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে তখন তার এই আহ্বানের ভিত্তি হতে হবে আল্লাহর উপরে ঈমান নতুবা তার আহ্বান গ্রহণযোগ্য হবে না। বিষয়টি প্রাথমিকভাবে ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তারপরে সঠিক আনুগত্যের সঙ্গে।

মুসলিমরা যদি সত্য ও সঠিক পথে নিজেদেরকে এবং ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে এসবের আধ্যাত্মিক ভিত্তি উপলব্ধি করতে হবে, যার উপায় হচ্ছে প্রথমে একে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অতঃপর এর পরিচর্যা করা। তখন ইসলামের আনুগত্য করা তার জন্য সহজতর হবে চাই তা বাস্তবতা, স্বভাব বা লোকজনের ইচ্ছার অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে গ্রহণ না করলে মুসলিমরা গুনাহগার হবে যদিও বা তা কুফরী না হয়। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে যা হচ্ছে আল্লাহর উপরে ঈমান এবং এ থেকে এটা বোঝা যায় না কোনো হুকুম সত্যের কতটুকু নিকটবর্তী অথবা কতটুকু দূরবর্তী। বরং কোনো হুকুমকে যদি আমরা এই ভিত্তির আলোকে বিবেচনা করি তাহলে বুঝতে পারব তা এই ভিত্তির কতটুকু নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী।

যারা এই ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বলে এবার তাদেরকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই; এই আহবানের আধ্যাত্মিক ভিত্তি কি? এর পিছনে আল্লাহর নির্দেশ কোথায় বিদ্যমান? রাসূল (সা.) কখন এই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন - যদিও তাঁর (সা.) মক্কা বা মদিনায় এর প্রয়োজন ছিল।

নুসরাহ খোঁজার সময় রাসূল (সা.) কি বনি আমর বিন সা'সা গোত্রকে বলেননি, "বিষয়টি (কর্তৃত্ব) আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" [সীরাতে ইবনে হিশাম] অথচ সে সময় দাওয়াতের জন্য সাহায্য তাঁর (সা.) জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। তারা রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব চেয়েছিল। তখন কি তিনি পারতেন না তাদের অনুরোধকে মেনে নিতে এবং পরবর্তীতে ঈমান আনার পরে তাদের এই অনুরোধকে পরিবর্তন করে দিতে? এটাই কি সত্য দাওয়াত ও আল্লাহর হুকুম ছিলনা যার ফলে কোনোরকম তোষামোদ বা আপোষ ছাড়াই রাসূল (সা.) সততার সঙ্গে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, যাতে যারা থাকে তার যেন স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে টিকে থাকে আর যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারা যেন স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?

চাচা আবু তালিব যখন দাওয়াতি কাজে আপোষ করতে বললেন এবং তার কাঁধে অসহনীয় বোঝা না চাপাতে বললেন তখন কি রাসূল (সা.) বলেননি যে; "আল্লাহর শপথ, চাচা! যদি তারা আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে

চন্দ্র এনে দেয় যাতে আমি বিষয়টি ছেড়ে দেই তবুও আমি ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করেন অথবা একাজ করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হয়।" [সিরাতে ইবনে হিশাম] এই দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে রাসূল (সা.) ন্যূনতম পরিমাণ আপোষও করেননি এবং তিনি দাওয়াতের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ রেখে গেছেন। তিনি (সা.) কোনোরকম আপোষ বা তোষামোদ করেননি, তাদের সঙ্গে তাল মিলাননি, বিনা আপত্তিতে প্রার্থনা করেননি। বরং তার দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য ও সাহসিকতাপূর্ণ কারণ এর ফলে সত্য চিন্তার জয় হবে এবং মিথ্যা পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ (সুবহানাল্লাহুতয়ালা) কি মুসলিমদেরকে সেই স্থান থেকে হিজরত করতে নির্দেশ দেননি যেখানে তারা তাঁর (সুবহানাল্লাহুতয়ালা) বাধ্যতামূলক নির্দেশ মানতে পারছিল না? তিনি কি সেখানে থাকতে তাদেরকে নিষেধ করেননি যখন তিনি (সুবহানাল্লাহুতয়ালা) বলেনঃ

"যারা নিজেদের অনিষ্ট করে (কারণ হিজরত বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও তারা কাফিরদের মধ্যেই বসবাস করছিল) ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?" [আল কুরআন ৪:৯৭]

এমন কোনো ভূখণ্ড যেখানে মুসলিমরা তাদের দ্বীন কায়েম করতে সক্ষম না সেখানে থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত একটি ইজমা বর্ণনা করেছেন ইবনে কাছির।

রাসূল (সা.) কি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" দিয়েই তাঁর দাওয়াতের সূচনা করেননি এবং লোকজনকে এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেননি? কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এটি ছিল তাঁর (সা.) শেষ বক্তব্যও। তিনি কি শুরুতে অল্প কিছু হাল্কা কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে তা বর্ধিত করেছেন? নাকি এটাই ছিল তাঁর (সা) প্রথম এবং শেষ আহবান।

যাকাত প্রদান যারা বন্ধ করে দিয়েছিল আবু বকর (রা.) কি কোনোরকম দেরি করা ছাড়া অথবা তাদেরকে সন্তুষ্ট করা ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি? তখন তিনি সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেনঃ

"আল্লাহর কসম, রাসূল (সা.)-কে তারা যা দিত যদি তার চাইতে একটা উটের রশিও আমাকে কম দেয় তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" তখন এভাবেই তিনি সাড়া দিয়েছিলেন যদিও মুসলিমরা সেসময় মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং বিদ্রোহের সূচনা করার মতো কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা দেখতে পাচ্ছিল।

প্রথম যুগের যেসব মুসলিম দাওয়াতি কাজ করতেন তারা কি কখনো এই ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়নের ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন? তারা কি এই চিন্তাটিকে সেসব ভূখণ্ডে বাস্তবায়ন করেছিলেন যেগুলো বিজিত হয়েছিল এবং দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল? প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ইসলামে নতুন দাখিল হওয়া লোকজনের পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেননি এবং তাদেরকে মদ্যপান করার সুযোগ দেননি, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি যতদিনে তারা মদ্য না করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সুদ খেতে এবং নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনেরও সুযোগ দেননি। বরং তারা ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করেছিলেন এবং সুদ, ব্যভিচার, মদ্যপান ও অন্যসবকিছু যেগুলোর ব্যাপরে আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত ছিলেন। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও মুসলিমরা সমস্ত শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়ন করেছিলেন সেগুলো আলাদা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে হোক, সামষ্টিকভাবে হোক, তাদের নিজস্ব বিষয়াদিতে হোক অথবা তাদের অংশবিশেষ আদয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে যায় এমনক্ষেত্রেই হোক।

ইসলামি ফিকহের প্রকৃত বইসমূহে কি এই বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? আমাদের প্রাথমিক দিককার নির্ভরযোগ্য ফকিহ ও মুজতাহিদগণ কি ক্রমান্বয়িকতার ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেছেন, যদিও আমরা জানি যে, তারা শরিআ'হর কুল্লিয়াত (সামগ্রিকতা) ও জুযিয়াত (শাখা) নিয়ে বিস্তারিত অলোচনা করেছেন?

শরীআ'হ সামগ্রিকভাবে এই বিষয়ের নির্দেশনা দেয় যে দাওয়াতের বাধ্যবাধকতা সততার সঙ্গে আদায় করতে হবে এবং সরলপথের উপরে থাকতে হবে;

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি। " [আল-কুরআন ১৮:১]

আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা চায় আমরা আপোষ করি এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যমতে পৌঁছাই। তারা চায় আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করি এবং প্রকৃত সমাধানের এক চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক গ্রহণ করি। তারা চেষ্টা করে যাতে আমরা কুফরি কর্মকাণ্ডের সূচনা করি। এ ব্যাপারে তিনি (সুবহানাল্লাহুতয়ালা) বলেনঃ

"আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলিম হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকম কাফির বানিয়ে দেয় ... [আল-কুরআন ২:১০৯]

এবং শেষে চেষ্টা করবে তাদের আইনকানুন গ্রহণ করাতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুবহানাল্লাহুতয়ালা) বলেনঃ

"তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।" [আল-কুরআন ৬৮:৯]

“অতএব আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবে না।” [আল-কুরআন ৬৮:৮]

পথভ্রষ্ট লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার ব্যাপারে আমাদের রব আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেনঃ

“আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, আর কোথাও সাহায্যও পাবে না।” [আল কুরআন ১১:১১৩]

প্রকৃত ঈমানের দিকে সঠিক দাওয়াত মুসলিমদের আনুগত্যকে পূর্ণতা দান করে যদিও সে ইসলামে নতুন দাখিল হয় এবং এর আনুগত্য করে থাকে। দাওয়াত বহনকারী হিসেবে আমাদের উপরে এটা বাধ্যতামূলক যে আমরা নিজেদের অন্তরে ঈমানকে প্রোথিত করব এবং নিজেদেরকে এর জন্য উৎসর্গ করব যতক্ষণনা সর্বোত্তম আনুগত্য ও তাকওয়ার সঙ্গে তা ফল দিতে শুরু করবে। ইসলামি রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অবশ্যই তা এমনসব লোকদের হাতে হবে না যার ইসলামি ধারণাশূন্য ও পাশ্চাত্যের ধারণায় পূর্ণ। এটি এমনসব লোকদের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হবে না যাদের মধ্যে দাওয়াতের কোনো প্রতিফলন হয়নি, দাওয়াত তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি এবং তারা একে গ্রহণ করেনি। বরং পূর্বে আমরা যা বলেছি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে সাধারণ গণজাগরণের মাধ্যমে সৃষ্ট জনমতের উপর ভিত্তি করে যা ইসলামের ধারণা এবং এর দ্বারা শাসিত হওয়ার ধারণাকে গ্রহণ করবে। মানুষের অন্তর ও মনকে ইসলামের কাছে টানার অজুহাতে ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন ধারণাকে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই, আর না আছে মানবীয় দুর্বলতার কাছে মাথানত করার অথবা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার, কারণ আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের অন্তর ও মন এবং পরিস্থিতিকে ইসলাম অনুযায়ী পরিবর্তন করার জন্য।

যদি আমরা কুরআনের দিকে ফিরে যাই এবং এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করি তাহলে দেখতে পাব এতে সেসব নির্দেশ দেওয়া আছে তা চূড়ান্ত এবং ক্রমান্বয়িকতার ধারণাটি পাশ্চাত্যের বিজাতীয় চিন্তাসমূহ থেকে তথাকথিত উলেমাদের দ্বারা মিথ্যা এবং ভ্রান্ততার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

যখনই কোনো আয়াত নাযিল হতো তখনই রাসূল (সা.) এবং তাঁর (সা.) সঙ্গের মুসলিমগণ কোনোরকম বিলম্ব না করে তা বাস্তবায়নের জন্য ছুটতেন। যেকোনো নাযিলকৃত হুকুমের বাস্তবায়ন কেবল এজন্য বাধ্যতামূলক ছিল যে তা নাযিল হয়েছে। যখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই আয়াতটি নাযিল করলেন;

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” [আল-কুরআন ৫:৩]

তখনই মুসলিমরা পুরো ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য বাধ্য হয়ে পড়ল, তা আক্বিদা, ইবাদাত, আখলাক, মুআমালাতের ক্ষেত্রে হোক অথবা বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা অথবা পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত হুকুমের ক্ষেত্রে হোক অথবা সন্ধি ও যুদ্ধের সময়েই হোকনা কেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [আল কুরআন ৫৯:৭]

অর্থাৎ রাসূল (সা.) যেসব বিষয় নিয়ে এসেছেন সেগুলো গ্রহণ করতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে এবং তিনি (সা.) যেসব বিষয়কে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকতে ও দূরত্ব বজায় রাখতে। কারণ এই আয়াতে 'মা' শব্দটি আম (সাধারণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমস্ত ফরযকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় এবং সমস্ত হারাম থেকে বিরত থাকার ও দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি এতে অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শেষদিকে উপস্থাপিত ক্বারিনা (নির্দেশনার)-এর ফলে আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ের গ্রহণ বা বর্জন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, কারণ এই ক্বারিনাতে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আয়াত অনুযায়ী যে কাজ করবে না তার জন্য ভয়াবহ শাস্তির সতর্কবাণী রয়েছে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন; "আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছন, সেইঅনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমনকোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।" [আল কুরআন ৫:৪৯]

এই আয়াতটি রাসূল (সা.) ও তাঁর পরবর্তী মুসলিমগণকে আল্লাহর নাযিলকৃত সমস্ত হুকুম অনুযায়ী শাসন করতে চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছে, তা আদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে হোক অথবা নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ে। এটি রাসূল (সা.) ও তাঁর (সা.) পরবর্তী মুসলিমদেরকে লোকজনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ এবং তাদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দিচ্ছে।

পাশাপাশি এটি রাসূল (সা.) ও তাঁর (সা.) পরবর্তী মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত কিছু বিষয়ের বাস্তবায়ন থেকে লোকজন তাদেরকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেন, "যারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী শাসন করেনা তারাই কাফির। " [আল-কুরআন ৫:৪৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ “যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারাই যালিম।” [আল-কুরআন ৫:৪৫]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) বলেনঃ “যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারাই ফাসিক।” [আল-কুরআন ৫:৪৭]

আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী শাসন করেনা তাদেরকে এসব আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) কাফির, যালিম ও ফাসিক সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এখানে উল্লিখিত ‘মা’ শব্দটি আম (সাধারণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে এতে আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনা থেকে কোনোরকম দ্ব্যর্থতা ছাড়া নিশ্চিতভাবেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কোনোরকম বিলম্ব, গড়িমসি অথবা ক্রমান্বয়িকতা ছাড়া ইসলামের সমস্ত হুকুম বাস্তবায়ন করতে ব্যক্তিগতভাবে, দলীয়ভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিমরা বাধ্য। ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসব হুকুম বাস্তবায়ন না করার কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন নীতিটি ইসলামের হুকুমের সঙ্গে পুরোপুরিই সাংঘর্ষিক। ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্র হিসেবে যদি আল্লাহর কিছু হুকুম কেউ বাস্তবায়ন করে এবং বাকিগুলো ছেড়ে দেয় তাহলে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে অপরাধী বলে গণ্য হবে।

কোনো ওয়াজিব বিষয় ওয়াজিবই থাকে যার উপরে আমল করা বাধ্যতামূলক এবং কোনো হারাম বিষয় হারামই থাকে যা থেকে দূরে থাকা বাধ্যতামূলক। যখন সাকিফের প্রতিনিধি রাসূল (সা.)-কে অনুরোধ করেছিল তিন বছর পর্যন্ত আল-লাত-এর মূর্তি না ভাঙতে অথবা ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে সালাত আদায় করা থেকে অব্যাহতি দিতে। তিনি (সা.) তাদের এসব প্রস্তাবে সম্মত হননি এবং পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোনোরকম বিলম্ব ছাড়াই মূর্তিগুলো ভাঙতে এবং সালাত আদায় করতে তিনি জোর দিলেন।

যেসব শাসক ইসলামের হুকুম বাস্তবায়ন করেনা অথবা যেসব শাসক সেগুলো থেকে অল্পকিছু বাস্তবায়ন করে আল্লাহ তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়েছেন। এই বিষয়টি তখন প্রযোজ্য যখন সে এগুলোর উপযুক্ততায় বিশ্বাস করেনা। উপযুক্ততায় বিশ্বাস করে ইসলামের সমস্ত হুকুম বাস্তবায়ন করে না অথবা কিছু হুকুম বাস্তবায়ন করে তাহলে সে যালিম বা ফাসিক বলে গণ্য হবে।

যদি কোনো শাসক প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত (যার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের কাছে বুরহান স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং তরবারি উন্মুক্ত করাকে রাসূল (সা.) আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। অর্থাৎ তারা যদি কুফরি আইন দিয়ে শাসন করে এবং এগুলোর কুফর হওয়ার

ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকে তাহলে এসব আইন অল্পসংখ্যক নাকি অধিক তা বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। উবাদাহ বিন সামিত থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছেঃ

"কর্তৃত্বশীল লোকদের সঙ্গে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাদে জড়াবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে এমন প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত হতে দেখেছ যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে বুরহান (স্পষ্ট প্রমাণ) আছে।" [মুসলিম থেকে বর্ণিত]

অতএব ইসলামের হুকুম বাস্তবায়নে কোনোরকম আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগা অথবা ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন অবলম্বন করার সুযোগ নেই, কারণ দুটো ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুটো হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং দুটো হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর সমস্ত হুকুমই একসমান। এদের সবগুলোকে একসঙ্গেই প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে কোনোরকম বিরতি, বিলম্ব অথবা কোন প্রকার ধাপছাড়া। নাহলে আমাদের উপরে আল্লাহর নিম্নোক্ত কথাটি প্রযোজ্য হবেঃ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং বাকি অংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে তাদের জন্য দুর্গতি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে।" [আল-কুরআন ২:৮৫]

কোনো মুসলিম, সে শাসক হোক অথবা কোনো সাধারণ ব্যক্তি, শর'ঈ হুকুম বাস্তবায়িত না করার কোনো অজুহাতই তার কাজে আসবেনা, যদিনা শর'ঈ দলিলসমূহে তার পক্ষে কোনো শর'ঈ রুখসাত (বাধ্যতামূলক কাজ থেকে অব্যাহতির সুযোগ) বিদ্যমান থাকে। প্রকৃত এবং অনুভবযোগ্য দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট অক্ষমতা যেমন জবরদস্তি ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাউকে জবরদস্তি করে কোনো হারাম করতে বাধ্য করা হলে অথবা যে পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) মদিনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ গাতফান গোত্রকে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন অথবা যখন একজন খলিফা বিদ্রোহীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন অথবা যখন অবরোধকালে মৃত্যুর আশংকা থাকলে হারাম গোশত খাওয়া বৈধ হয়ে যায়-এসব বিষয়কে শর'ঈ রুখসাত হিসেবে গণ্য করা যায়।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন অনুসরণ থেকে আমরা যা বুঝতে পারছি, যারা এর পক্ষে কথা বলে তাদের মধ্যে এই ধারণাটির জন্ম হয়েছে পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত চাপের ফলে। এরকম চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা এর পক্ষে প্রমাণ খুঁজতে শুরু করেছে যাতে এই পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তারা যুক্তি ও অনুমোদন প্রদর্শন করতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে তাদের মধ্যে ধারণাটির জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তীতে ধারণাটিকে সংরক্ষণের জন্য তারা শরিয়াহ'কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যাতে এর পক্ষে শর'ঈ দলিল উপস্থাপন করতে পারে। এটই হল বিচ্যুতির সূচনা। যেসব মুসলিম এই ধারণাটিকে গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ হচ্ছে তারা যেন নিজেদের মধ্যকার দুর্বলতাকে অপসারণ করে। শরীআ'হর সঙ্গে তাদের

সম্পর্ক এরূপ হতে হবে যেন তারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) উপরে মজবুত ঈমান রাখে যিনি সমস্ত বিষয় তাদেরকে দান করেন। তাদেরকে এরূপই হতে হবে যাতে তারা এই ঈমান নিয়ে কঠোর বাস্তবতা ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। তার এই ঈমান তার মধ্যে উন্নত অনুভূতির সৃষ্টি করবে এবং পরিস্থিতির তোয়াক্কা করবে না। শরিয়াহ'র সঠিক সীমানাতে অবস্থান এবং প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমেই লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে, কোন ধাপ গ্রহন করা ছাড়াই এই কাজটি সম্পাদন করতে হবে।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান হচ্ছে ইসলাম ভিন্ন অন্যকিছুর দিকে আহবান, যা হারাম। এর ভিত্তিতে যখন কোনো বিষয়ের দিকে অমুসলিম ও ত্রুটিপূর্ণ মুসলিমদেরকে আহবান করা হয় তারা সেগুলো গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এই দ্বিধাগ্রস্ততার দায়ভার তাদেরই যারা ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান করে। কারণ, তাদের কাছে প্রকৃত ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়নি এবং এই উপস্থাপনার ভিত্তি ইসলামের আধ্যাত্মিক ভিত্তি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর উপরে ঈমান এবং যে ভিত্তিতে শর'ঈ হুকুম গ্রহণ করা হয় তা থেকে অনেক দূরে। ফলে আল্লাহর হুজ্জাহ (প্রমাণ) তাদের বিরুদ্ধে যায় যারা ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান করে; তাদের বিরুদ্ধে যায়না যাদেরকে আহবান করা হয়েছে।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য বিস্তার যার মাধ্যমে ইসলামের আংশিক বাস্তবায়নের পথ সুগম হয় এবং এক্ষেত্রে তাদের অজুহাত হচ্ছে শরীয়াহ'র পূর্ণাঙ্গ ও তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য তাদের নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) আমাদেরকে যা দিয়েছেন সেগুলোর সামনে নতুন কিছু উপস্থাপন না করতে অথবা সেগুলো থেকে বিচ্যুত না হতে আমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান যিনি দেন, তিনি হচ্ছেন মানুষের রব, সর্বজ্ঞানী, সমস্ত খবরের অধিকারী এবং যিনি জানেন তিনি কি সৃষ্টি করেছেন। ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবানের সময় একজন মুসলিম কীভাবে নিজেকে এই অনুমতি দেয় যে সে আইন প্রণয়নের এই প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে? একজন দাঈর (দাওয়াত বহনকারী) প্রকৃত অবস্থান হচ্ছে সে কেবল সমাধানকে কার্যকর করা ও বহন করার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখবে এবং একে প্রণয়ন করতে যাবে না।

ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবান দা'ঈকে একটি নষ্ট চিন্তার পথ প্রদর্শন করে যার ভিত্তিতে যে লোকজনকে আহবান করে। ধাপে ধাপে ইসলামের বাস্তবায়ন পদ্ধতির দিকে আহবানের ফলে কেউ যদি এর দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তা তার চিন্তার প্রক্রিয়াকে দূষিত করে দিবে, যা অন্যান্য দূষিত চিন্তার মতোই পরিবর্তন করা জরুরী। যেহেতু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিন্তার প্রক্রিয়াই শুরুতে আসে সেহেতু চিন্তা পরিবর্তন করার চেয়ে চিন্তার প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ না একটি সাধারণ উপায়ে উম্মাহর চিন্তার প্রক্রিয়াকে আমরা পরিবর্তন করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত উম্মাহর অবস্থার কোনো নির্ভরযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে না। যে দূষিত প্রক্রিয়ায় সে চিন্তা করে এবং লোকজনকে আহবান করে তা প্রতিস্থাপন করে সেখানে চিন্তার সঠিক প্রক্রিয়াকে বসাতে হবে।

Please note that this is a draft translation. It is likely to go through further edits. So, we would suggest not spreading this widely or publishing this anywhere online for the time being.